প্রথম আলো

কলাম

মতামত

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষার যৌক্তিকতা কতটুকু

নাদিম মাহমুদ
লেখক ও গবেষক

আপডেট: ০১ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ৪৪

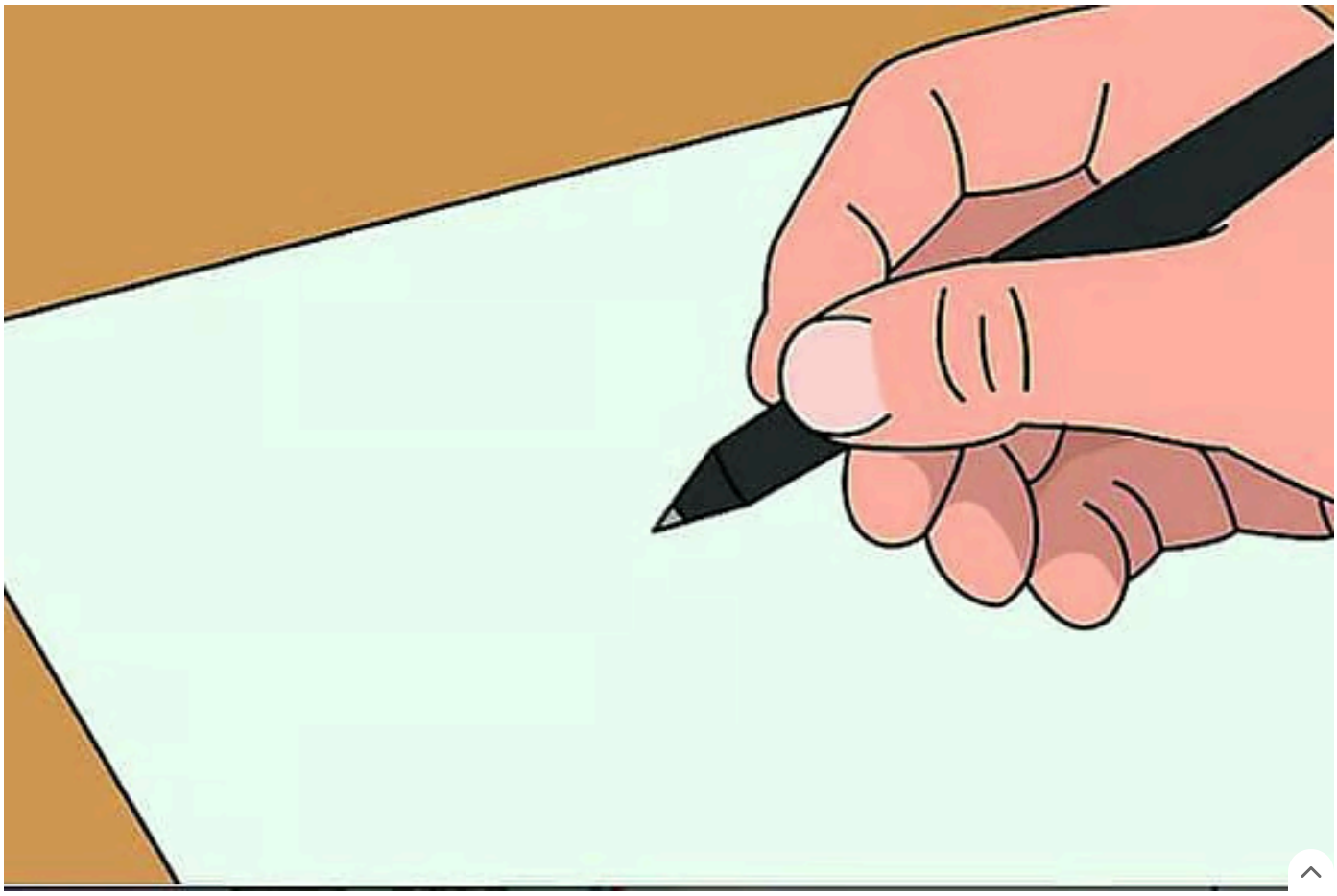

বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্ভবত দেশের সবচেয়ে সহজ কোনো ‘নিয়োগপ্রক্রিয়া’, যা বছরের পর বছর ধরে চর্চিত হয়ে আসছে। আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর মাত্র কয়েক মিনিটের এক মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকেরাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াচ্ছেন।

অথচ এই দেশে প্রাথমিক শিক্ষক হতে গেলেও কয়েকটি ধাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। ফলে ‘ত্রুটিযুক্ত’ শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াকে যুগোপযোগী কিংবা বিশ্বমানদণ্ডের পরিসরে আনার আহ্বান সব সময় ছিল।

সমাজে এসব আলাপের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ২০১৬ সালের দিকে একটি কমিটি গঠন করে, যাঁরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য একটি ‘অভিন্ন নীতিমালা’ করার সুযোগ মিলে।

এই কমিটি কয়েকবার খসড়া করে ২০১৯ সালের দিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদোন্নতির একটি ‘অভিন্ন’ নীতিমালা বা নির্দেশিকা চূড়ান্ত করে। যদিও এই নীতিমালার নানা অসংগতি ছিল, যা নিয়ে খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে।

এই নীতিমালার ৩ ধারায় বিভিন্ন অনুষদের প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য এসএসসি ও এইচএসসির জিপিএ এবং স্নাতক বা স্নাতকোত্তরের সিজিপিএকে যোগ্যতা পরিমাপের মানদণ্ড ধরে বিশেষ দ্রষ্টব্যে বলা হচ্ছে, এক. এমফিল-সমমান বা পিএইচডি অতিরিক্ত ডিগ্রি হিসেবে গণ্য হবে, দুই. বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রভাষক নিয়োগের জন্য ‘প্রয়োজনে’ লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে একটি শর্টলিস্ট করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে।

এই যে দুই নম্বর শর্তের বিষয়ে আমরা অনেকে প্রতিবাদ করে আসছি। এটা নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও হয়েছে অনেক। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ‘নয়া অধ্যায়’ শুরু করছে।

আগে যেখানে কেবল মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক’ হওয়া যেত, সেই জায়গায় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মৌখিক পরীক্ষা হওয়ায় অনেকেই ভাবছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের এই নিয়ম যৌক্তিক এবং সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। যাঁরা যৌক্তিক মনে করছেন, তাঁরা আমার এই আলোচনার শেষে নিজের উত্তর খুঁজে পাবেন।

একজন শিক্ষক হওয়ার জন্য যেসব যোগ্যতা বাইরে বিবেচনা করা হয়, তা আমাদের দেশে অতিরিক্ত যোগ্যতা কিংবা যোগ্যতার শিথিলতায় আনা হয়েছে, সেসবকে কখনোই মুখ্য করেননি। ফলে মাস্টার্স পাস করা শিক্ষার্থীদের সহকর্মী করা হচ্ছে, রাজনৈতিক সুপারিশপ্রাপ্তদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, আবার তাঁদেরকেই সবেতনে পিএইচডি করার জন্য দেশের বাইরে পাঠানো হচ্ছে। অথচ সেই যোগ্যতার ডক্টরেট ডিগ্রিধারীকে এসে হতাশা নিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। লিখিত পরীক্ষার ফলে সেটিই হওয়ার কথা।

দেখুন, বাংলাদেশে প্রচলিত এসব নিয়োগে যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বছরের পর বছর ধরে নিয়োগপ্রক্রিয়া চালু আছে, বিশ্বাস করুন, এ ধরনের শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়া উন্নত কিংবা পার্শ্ববর্তী ভারতেও নেই। এমনকি এত সহজে বাইরের দেশে কখনো বাচ্চাদের স্কুলের শিক্ষকও হতে পারবে না।

গণ-অভ্যুত্থানের পরও সেই একই ধারায় নিয়োগপ্রক্রিয়া চলে আসছে। লিখিত পরীক্ষা নিয়ে প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা কীভাবে ভালো কিংবা যোগ্য প্রার্থীদের বেছে নেওয়ার উত্তম প্রক্রিয়া নয়, তার উদাহরণ হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এক প্রার্থীর পাঠানো এক বার্তাকে কেস স্টাডি হিসেবে দেখা যাক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রার্থী আমাকে জানিয়েছেন, এই শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় আসা এক শিক্ষার্থী জাপান থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি করে এসেছিলেন শিক্ষক হওয়ার জন্য, কিন্তু ওই লিখিত পরীক্ষার কারণে তিনি বাদ পড়েছেন। এ ছাড়া সেখানে বেশ কিছু প্রার্থী ছিলেন, যাঁরা স্নাতক বা স্নাতকোত্তরে প্রথম বা দ্বিতীয় এবং গবেষণা প্রবন্ধ আছে। ওই প্রার্থীর অভিযোগ, সবারই বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী রাজনৈতিক সুপারিশ আছে।

তাহলে প্রশ্ন উঠে লিখিত পরীক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পিএইচডিধারী, প্রকাশনাধারীদের শর্টলিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হলো, এই লিখিত পরীক্ষায় ভালো করা প্রার্থীই-বা কেন ভালো?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় *ফাইল ছবি*

মুখস্থনির্ভরতা আমাদের যে গিলে ফেলছে, তাঁর অতীত উদাহরণ আমাদের আছে। এই যে ধরেন, বিসিএস পরীক্ষার কথা। এখানে একজন শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়াবলির ওপর বছরের পর বছর ধরে পড়তে হচ্ছে, মুখস্থ করতে হচ্ছে এবং সেগুলো উগরে দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হচ্ছে। এটি আদৌও কি মেধা যাচাইয়ের পরীক্ষা? না, এটি কেবল একধরনের প্রতিযোগিতা, যা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

এখন এই বিসিএস স্টাইলে এমপিথ্রি ও সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে না হলেও সাম্প্রতিক চালু হওয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, তারাও কিছু মৌলিক প্রশ্ন পরীক্ষায় আনছে, যা ওই বিভাগের কোনো বর্ষের। যে প্রশ্নগুলো প্রার্থীদের সেই বিভাগগুলোর পরীক্ষাগুলোতে, এমনকি মৌখিক পরীক্ষাও নেওয়া হয়। তাহলে সেই একই স্টাইলে কেন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় আসবে?

প্রথমত, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে বিষয়গুলো পড়ানো হয়, তা মূলত একটি বর্ষের পর পরের বর্ষে সিলেবাসে কী কী ছিল তা অনেক শিক্ষার্থী মনে রাখতে পারেন না। এর কারণ মূলত বই না পড়ে, কেবল নোট কপিভিত্তিক, আরও স্পষ্ট বললে পুরোনো বর্ষের প্রশ্নপত্র সমাধান করে পরীক্ষাগুলোতে ভালো ফল করা সম্ভব হয়। এই রোগটি যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে।

শিক্ষকেরা মূলত সেই পুরোনো প্রশ্নপত্র ঘেঁটেই প্রশ্ন করেন। ফলে সিলেকটিভ প্রশ্নগুলোর উত্তরপড়ায়, শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই তেমন একটা পড়েন না। আবার আগের বছর যে প্রশ্ন চলে এসেছে, সেগুলো বাদ দেওয়ায় অনেক বেসিক বিষয়ে তাঁদের জানাশোনার অভাব পড়ে। ফলে সিজিপিএর দৌড়ে ভালো করলেও একধরনের শূন্যতা নিয়ে প্রথম বছর থেকে উত্তীর্ণ হোন। আবার এমন ঘটনা ঘটে, চতুর্থ বছর এসে প্রথম ও দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বর্ষের টপিকগুলো ভুলে যান। এটাই স্বাভাবিক।

এখন যদি কোনো শিক্ষার্থী ওই বাদ পড়া বেসিক প্রশ্নগুলো না পড়ে ভালো ফল করে চলে আসেন, তাহলে আজকের এই শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় তিনি সেটির উত্তর জানবেন না এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে মাস্টার্সে এসে নির্দিষ্ট বিষয়ে থিসিস করার কারণে কিংবা পরবর্তী সময়ে পিএইচডি করার সুবাদে সেই শিক্ষার্থী বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে। সে বিষয়ে জানাশোনা বেশি হওয়ায় অন্যান্য বিষয়ে তার মনোযোগ তেমন থাকবে না।

এমনকি বিভাগের প্রথম বর্ষের টপিকটি মাস্টার্স দুই বছর আর পিএইচডি তিন বছর—মোট পাঁচ বছর পর সেটি কি মনে থাকে? কিন্তু এটাই তাঁর মেধা যাচাইয়ের মূল কারণ হতে পারে না। বরং সে পিএইচডি করেছে, তাঁর গবেষণার খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চাওয়া প্রাসঙ্গিক হয়।

দেশে সত্যি সত্যি উচ্চশিক্ষার প্রচার ও প্রসার করার প্রয়োজন অনুভব করলে শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালাকে আন্তর্জাতিক ফরম্যাটে আনতে হবে। গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারকে তাগাদা দিতে হবে, মানুষকে বোঝাতে হবে আমাদের বিজ্ঞান প্রয়োজন,

আমাদের উচ্চশিক্ষায় জ্ঞান সৃষ্টির প্রয়োজন। সেটা করতে না পারলে পরমুখাপেক্ষী হয়ে বেশি দিন চলা সম্ভব নয়।

ওই প্রার্থীর অভিযোগ যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে মনে রাখতে হবে, আমরা উচ্চশিক্ষায় কোনো পরিবর্তনের ছোঁয়া দেখতে পাই না। এভাবে যদি লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসা শুরু করে, তাহলে দেখা যাবে একদিন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ পরীক্ষায় আসা প্রশ্নপত্র নিয়ে বাজারে নোট গাইড বের হচ্ছে, প্রার্থীরা সেই মুখস্থবিদ্যায় পারঙ্গমতা দেখাতে সেগুলো কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। তাহলে কি মুখস্থ পড়াশোনার ঘেরাটোপে আসা ভর্তি পরীক্ষার মতোই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার এই নতুন অধ্যায় চালু হবে?

শর্টলিস্ট করার জন্য যে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, সে শর্টলিস্ট করার জন্য কেন পিএইচডি, পোস্টডককে গুরুত্ব দেওয়া হলো না? কেন পাবলিকেশন ও সাইটেশনকে শর্টলিস্ট করার জন্য যোগ্য মনে করা হলো না? আপনি বিশ্বাস করেন, কালই যদি বলেন পিএইচডি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়া হবে না, দেখবেন এই আবেদন সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে। ভালো মানের পাবলিকেশন, ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টরের গুরুত্ব দিলে আরও অর্ধেক নেমে এসেছে। যা আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত কঠোরভাবে চর্চা করে আসছে।

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় *ফাইল ছবি*

একজন শিক্ষক হওয়ার জন্য যেসব যোগ্যতা বাইরে বিবেচনা করা হয়, তা আমাদের দেশে অতিরিক্ত যোগ্যতা কিংবা যোগ্যতার শিথিলতায় আনা হয়েছে, সেসবকে কখনোই মুখ্য করেননি। ফলে মাস্টার্স পাস করা শিক্ষার্থীদের সহকর্মী

করা হচ্ছে, রাজনৈতিক সুপারিশপ্রাপ্তদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, আবার তাঁদেরকেই সবেতনে পিএইচডি করার জন্য দেশের বাইরে পাঠানো হচ্ছে। অথচ সেই যোগ্যতার ডক্টরেট ডিগ্রিধারীকে এসে হতাশা নিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। লিখিত পরীক্ষার ফলে সেটিই হওয়ার কথা।

দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাসের প্রথম ১০ জন ভালো ফলকারীরাই আসছে। একই বিভাগ থেকে পড়াশোনা করে আসা প্রার্থীরাই সেখানে আবেদন করছে। ফলে সমপর্যায়ের বিভাগগুলো থেকে ক্রস ব্রিডিং বা ডাইভার্সিটি হওয়ার সুযোগ মিলছে না। এই ডাইভার্সিটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের দেশের শিক্ষক নিয়োগব্যবস্থায় এখনো গুরুত্ব পায়নি, যা ভাবতেই কষ্ট লাগে।

দেখুন, আমরা যারা বাইরে থেকে দেশের এই গলদ ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, তারা ভালো করেই জানি, এই দেশটার পরিবর্তনের জন্য সদিচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাইরের দেশে একটি পদের জন্য ২০-৩০ জন আবেদন করে অনলাইনে।

আবেদনের যোগ্যতায় বলা হয়, আপনি এই পদে আগ্রহী হলে আপনার পিএইচডি থাকবে, আপনি কেন শিক্ষক হতে চান তার ব্যাখ্যা করুন, আপনি বর্তমান ও আগামী পাঁচ বছরের গবেষণার পরিকল্পনা লিখুন। আপনি কীভাবে গবেষণার তহবিল সংগ্রহ করবেন, সে বিষয়ে আপনার চিন্তাশীলতা জানান। ইংরেজির দক্ষতা কেমন তা জানেন, সেই আবেদন প্রক্রিয়াটির শর্তগুলোর মাধ্যমে। সর্বোপরি আপনি শিক্ষক হয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে অবদান রাখতে পারবেন?

সবচেয়ে বড় বিষয়, এই আবেদন দেখে কমিটি শর্টলিস্ট করে। পরবর্তী সময়ে তাঁদের মৌখিক পরীক্ষা নেন, প্রেজেন্টেশন নেন। সর্বশেষ যাঁদের জন্য শিক্ষক নেওয়া, সেই শিক্ষার্থীদের সামনে ওই প্রার্থী প্রেজেন্টেশন দেয়, শিক্ষার্থীদের দেওয়া নম্বর ওই প্রার্থীর যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়।

এগুলো হলো শিক্ষক নিয়োগে প্রার্থীদের যাচাইয়ের যোগ্যতা; যা আমেরিকা, কানাডা ও অন্যান্য দেশে বহুল চর্চিত হয়। হ্যাঁ, এ কথা সত্য, আমাদের দেশে গবেষণার পরিবেশ গড়ে ওঠেনি, বাজেটে অপ্রতুলতা আছে। কিন্তু সেটা করা যাবে না, তা তো নয়। আজকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বলে যে শিক্ষক নিয়োগের সংস্কার প্রয়োজন, কাল থেকে যদি তাঁরা পিএইচডি-পোস্টডক ছাড়া নিয়োগপ্রক্রিয়া বন্ধ করে, বিশ্বাস করুন দেশে ফিরতে মুখিয়ে থাকা হাজারো ছেলেমেয়ে দেশে ফিরত। অথচ আমরা পড়ে আছি সেই এসএসসি-এইচএসসি জিপিএর ওপর। আর এখন শর্টলিস্ট করার জন্য লিখিত পরীক্ষার আয়োজন করে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ে আরও প্রশ্নই তৈরি করা হলো, যা সামগ্রিক বিচারে বড় ধরনের ক্ষতি।

ইউজিসি তাঁদের ওই নীতিমালায় কেবল ‘প্রয়োজনে লিখিত পরীক্ষা’ এই বিতর্কিত অংশটি জুড়ে দেয়নি, অভিন্ন শিক্ষক নিয়োগকাঠামোর নামে বেশ কিছু বিতর্কিত বিষয় রেখে দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিব্যবস্থাকে কুক্ষিগত

করে ফেলার চেষ্টা করেছে, যা কখনোই সভ্য দেশে দেখা যায় না। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ছাড়া সরাসরি সহকারী অধ্যাপক হওয়া যায় না, এমন বালখিল্য নিয়মে আটকা শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা।

দেশে সত্যি সত্যি উচ্চশিক্ষার প্রচার ও প্রসার করার প্রয়োজন অনুভব করলে শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালাকে আন্তর্জাতিক ফরম্যাটে আনতে হবে। গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারকে তাগাদা দিতে হবে, মানুষকে বোঝাতে হবে আমাদের বিজ্ঞান প্রয়োজন, আমাদের উচ্চশিক্ষায় জ্ঞান সৃষ্টির প্রয়োজন। সেটা করতে না পারলে পরমুখাপেক্ষী হয়ে বেশি দিন চলা সম্ভব নয়।

ইউজিসি ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনুরোধ করব, আসুন, এই অযৌক্তিক ও সেকেলে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি বন্ধ করুন। এই নীতিমালার সংস্কারে কমিশন করুন, দেখবেন দেশটার পরিবর্তন কেউ আটকাতে পারবে না।

- **ড. নাদিম মাহমুদ** গবেষক, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: nadim.ru@gmail.com

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো